ভাস্করাচার্য ও লীলাবতী

বিশ্বনাথ দাস

ভাস্করাচার্য ছিলেন দ্বাদশ শতাব্দীর এক বিশিষ্ট গণিতজ্ঞ। সংস্কৃতে কয়েকটি অসামান্য গণিত-গ্রন্থ রচনার জন্য তাঁর খ্যাতি কালক্রমে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছিল। 'লীলাবতী' তাঁর রচিত মহাগ্রন্থ 'সিদ্ধান্তশিরোমণি'র অন্তর্গত একটি গ্রন্থের নাম। আবার তাঁর অত্যন্ত বিদুষী কন্যার নামও ছিল লীলাবতী।

ভারতবর্ষে গণিতচর্চার ইতিহাস বেশ সুপ্রাচীন। মহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পায় প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের সূত্রে যেসব নিদর্শন পাওয়া গেছে (যেমন নিখুঁতভাবে তৈরি বিভিন্ন মাপের ঘনকাকৃতি বাটখারা, বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের দাগকাটা পাত্র ইত্যাদি) সেসব থেকে সহজে অনুমান করা যায় যে সিন্ধুসভ্যতার যুগেও (৩৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে) ভারতীয়দের কিছুটা গণিতজ্ঞান ছিল। বৈদিক যুগে (খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত) এদেশে যে গণিতের ভালোরকম চর্চা ছিল তার প্রচুর উল্লেখ পাওয়া যায় বিভিন্ন ব্রাহ্মণ, সংহিতা ও উপনিষদে। শূন্যের আবিষ্কার এবং শূন্যসহ দশটি অঙ্কযুক্ত দশাঙ্ক সংখ্যামালা তথা দশমিক স্থানীয় মান পদ্ধতিতে তাদের ব্যবহার-প্রণালীর প্রবর্তন গণিতচর্চায় ভারতের একটি যুগান্তকারী অবদান।

ভাস্করাচার্যের আগে যেসব খ্যাতনামা ভারতীয় গণিতবিদের বিবরণ জানা যায় তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন মহর্ষি বৌধায়ন, কাত্যায়ন, প্রথম আর্যভট্ট, বরাহমিহির, প্রথম ভাস্করাচার্য (৫২২ খ্রিঃ), ব্রহ্মগুপ্ত, মহাবীর, দ্বিতীয় আর্যভট্ট প্রমুখ।

ভাস্করাচার্য : প্রাচীন ভারতে গণিতচর্চা প্রসঙ্গে দুই ভাস্করের উল্লেখ পাওয়া যায়। একজন আর্যভট্টের টীকাকার এবং লঘুভাস্করীয় ও মহাভাস্করীয় গ্রন্থের রচয়িতা প্রথম ভাস্করাচার্য। আমাদের আলোচ্য ভাস্কর হলেন দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য। বর্তমান আলোচনায় আমরা তাঁকে শুধুই ভাস্করাচার্য হিসেবে উল্লেখ করব।

আজ থেকে প্রায় নশো বছর আগের কোনও মানুষ সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্যসংগ্রহ বেশ দুরূহ। কিন্তু সৌভাগ্যবশত প্রাচীন গ্রন্থকারদের মধ্যে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী ভাস্করাচার্য তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে পিতৃপরিচয়, জন্মসাল ও জন্মস্থান, বিভিন্ন গ্রন্থ রচনার কাল—এসব তথ্য দিয়ে গেছেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, প্রাচীন হিন্দুগণ সংখ্যাবোধক বিভিন্ন শব্দ ব্যবহার করতেন এক একটি সংখ্যার পরিবর্তে। যেমন এক অর্থে চন্দ্র, মহী; দুই অর্থে পক্ষ, নেত্র, কর্ণ ইত্যাদি; তিন অর্থে গুণ (সত্ত্ব, রজ, তম), ভুবন, অগ্নি; চার অর্থে বেদ, যুগ, সমুদ্র; পাঁচ অর্থে ইন্দ্রিয়, শাস্ত্র, প্রাণ ইত্যাদি; ছয় অর্থে রস, ঋতু, রাগ, অঙ্গ, দ্রব্য; সাত অর্থে নাগ, পর্বত, ঋষি, অত্রি; আট অর্থে বসু, অহি, মাতঙ্গ, তনু, দ্বীপ; নয় অর্থে গ্রহ, অঙ্ক, নিধি, কর্ণধার, কেশব; এবং শূন্য অর্থে আকাশ, পূর্ণ (অখণ্ডমণ্ডলাকার আকৃতি সাদৃশ্যে)। তৎকালীন প্রথা অনুযায়ী সাল উল্লেখ করা হত শকাব্দে এবং তা পাওয়া যেত সংখ্যাবোধক শব্দশৃঙ্খলটি বিপরীত দিক থেকে পাঠ করে (অঙ্কস্য বামা গতিঃ)।

নিজের জন্মবৎসর সম্বন্ধে ভাস্করাচার্য লিখেছেন :

'রসগুণপূর্ণমহীসমশকনৃপসময়ে ভবন্মমোৎপত্তিঃ'। —অর্থাৎ তাঁর জন্ম ৬ (রস) ৩ (গুণ) ০ (পূর্ণ) ১ (মহী)-কে উলটে নিয়ে ১০৩৬ শকাব্দে—১১১৪ বা ১১১৫ খ্রিস্টাব্দে। বছরের কোন সময় তাঁর জন্ম তা সঠিক জানা না থাকায় সাধারণভাবে তাঁর জন্মসাল ধরা হয় ১১১৪।

ভাস্করাচার্যের জন্ম বিশিষ্ট পণ্ডিতবংশে। মুম্বইয়ের নিকটবর্তী চালিশগাঁও থেকে ষোলো কিলোমিটার দূরে পাটনা গ্রামে দেবী ভবানী মন্দিরের ভগ্নাবশেষের মধ্যে আবিষ্কৃত হয় এক শিলাফলক। তাতে উৎকীর্ণ রয়েছে ভাস্করাচার্যের ঊর্ধ্বতন ছয় এবং অধস্তন দুই পুরুষের নাম—ত্রিবিক্রম, ভাস্করভট্ট, গোবিন্দ, প্রভাকর, মনোরথ, মহেশ্বর, ভাস্কর, লক্ষ্মীধর ও চঙ্গদেব। জানা যায়, প্রত্যেকেই সংস্কৃতে পণ্ডিত এবং জ্ঞানবিজ্ঞানে তাঁদের অবদানের জন্য যশস্বী হয়েছিলেন।

ভাস্করাচার্যের জন্মস্থান হিসেবে তাঁর নিজের লেখায় উল্লেখ পাওয়া যায় বিজ্জড়বিড় গ্রামের। সমসাময়িক বিভিন্ন ঐতিহাসিক বিবরণে রয়েছে প্রায় একইরকম কয়েকটি নাম—বিজ্জলপুর, বিড়-নগরম, বিজয়পুর, বিজাপুর, বিদ্যাপুর। ঐতিহাসিকদের ধারণা, বিজ্জলপুর বা বিজ্জড়বিড় সম্ভবত আরোপিত নাম, সমসাময়িক রাজা বিজ্জলকে সম্মান জানানোর উদ্দেশ্যে। সবদিক বিবেচনা করে তাঁরা রায় দিয়েছেন, গ্রামটির তৎকালীন নাম বিজয়পুর, বর্তমান নাম বিজাপুর।

শাণ্ডিল্য গোত্রীয় কানাড়ি ব্রাহ্মণ ভাস্করের শিক্ষালাভ তাঁর পিতৃদেব মহেশ্বরাচার্যের কাছে। বৃত্তশতক গ্রন্থের রচয়িতা জ্যোতির্বিদতিলক মহেশ্বর অধ্যাপনার ক্ষেত্রে খ্যাতি অর্জন করেন। ধর্মনিষ্ঠ এই আচার্য ছিলেন চতুর্বেদে পারদর্শী এবং কবিকুলের সম্মানিত। পাণ্ডিত্য, নিকটবর্তী চালিশগাঁওয়ে বিভিন্ন গাণিতিক বিষয়ে অবিরাম চর্চা, গ্রন্থরচনা ও শিক্ষকতার সূত্রে ভাস্করাচার্যের খ্যাতি ক্রমশ চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত হয়। একসময় তিনি বরাহমিহির ও ব্রহ্মগুপ্তের বিচরণক্ষেত্র উজ্জয়িনীর মানমন্দির ও তৎসংলগ্ন শিক্ষায়তনে অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হন। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে রয়েছে সিদ্ধান্তশিরোমণি, বাসনাভাষ্য, করণকুতূহল, বিবরণ ও বীজপণ্য। একাত্তর বছর বয়সে সম্ভবত উজ্জয়িনীতেই তাঁর মৃত্যু হয়।

ভাস্করাচার্যের পরিচয় প্রসঙ্গে উল্লিখিত শিলাখণ্ডে উৎকীর্ণ রয়েছে (বঙ্গানুবাদে) : ''ভট্টে পারদর্শী, সাংখ্যে মাননীয়, তন্ত্রে অদ্বিতীয়, বেদে গভীর জ্ঞানসম্পন্ন, ত্রিবিদ্যায় মহান, ছন্দে স্বাধীন, বৈশেষিক শাস্ত্রে ঘনিষ্ঠ, প্রভাকর-পদ্ধতিতে প্রভাকরতুল্য, কাব্যে কবি, গণিতাদি তিন সূক্ষ্মবিদ্যায় ত্রিনয়ন (শিব) তুল্য, জ্ঞানিজন যাঁর চরণে প্রণত, সেই ভাস্করাচার্যের জয়।''

'সিদ্ধান্তশিরোমণি' তাঁর অতুল কীর্তি, 'Magnum Opus'। ছত্রিশ বছর বয়সে তিনি এটি রচনা করেন ('রসগুণবর্ষেণ ময়া সিদ্ধান্তশিরোমণিঃ রচিতঃ।' রস = ৬, গুণ = ৩; বিপরীত দিক থেকে ৩৬)।

সিদ্ধান্তশিরোমণির অন্তর্ভুক্ত চারটি গ্রন্থ—লীলাবতী, বীজগণিত, গোলাধ্যায় ও গ্রহগণিত। এগুলির মধ্যে লীলাবতী ও বীজগণিত বহুদিন যাবৎ পাঠ্যপুস্তকরূপে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করায় এদুটি আলাদাভাবে সংকলিত হয়েছিল। টীকাকারগণ চারটি গ্রন্থকে ভাষ্যসহ পৃথকভাবে সংকলিত করেছেন। ভাস্করাচার্যের লেখার ওপর দুই শতাধিক টীকার সন্ধান পাওয়া গেছে। তবে আলাদাভাবে সংকলিত হলেও চারটি গ্রন্থ যে সিদ্ধান্তশিরোমণিরই অংশ তার নির্ভুল প্রমাণ প্রতিটি অধ্যায়ের শেষ বাক্যে নিজেই লিপিবদ্ধ করে গেছেন : ইতি শ্রীভাস্করীয়ে সিদ্ধান্তশিরোমণ্যৌ লীলাবতী-বীজগণিতঃ-গোলাধ্যায়ঃ-গ্রহগণিতসংজ্ঞঃ-পাঠাধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

লীলাবতী ও বীজগণিত গ্রন্থে পাটিগণিত, বীজগণিত ও জ্যামিতির প্রধান প্রধান সিদ্ধান্তগুলি সন্নিবেশিত হয়েছে। গোলাধ্যায়ে স্থান পেয়েছে বৃত্ত ও গোলকের প্রকৃতি সম্বন্ধে গাণিতিক আলোচনা; সময়, স্থান ও দিক সম্বন্ধে চর্চা; সূর্যঘড়ি, জলঘড়ি, ফলক, যষ্টি, ধীযন্ত্র ইত্যাদির ব্যবহার; ঋতুনির্ণয়, সৃষ্টিতত্ত্ব ইত্যাদি। গ্রহগণিতে প্রধানত আলোচিত হয়েছে সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ, গ্রহদের গতিবিধি, ছায়ামিতি ইত্যাদি। বাসনাভাষ্য তাঁর নিজ রচনার টীকা।

লীলাবতী : লীলাবতী সম্পর্কে ভারতকোষে (পঞ্চম

খণ্ড, পৃঃ ৪৫৮—৪৫৯) বলা হয়েছে : "... বিবাহের অব্যবহিত পরেই লীলাবতী পতিহীনা হইলেন। ভাস্করাচার্য কন্যাকে স্বগৃহে রাখিয়া পরম যত্নে বিদ্যাশিক্ষা দিলেন। উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। সিদ্ধান্তশিরোমণি নামক যে বিখ্যাত গ্রন্থ ভাস্করাচার্য রচনা করেন, তাহার তৃতীয় খণ্ড লীলাবতীর দ্বারা রচিত। ভাস্করাচার্য এই গ্রন্থের নাম দিলেন 'লীলাবতী'। পাটিগণিত ও বীজগণিতের এই সূত্রগুলি অদ্যাবধি লীলাবতীর নামেই প্রচলিত।" কিন্তু একথা আদৌ সঠিক নয়। এটি (তৃতীয় নয়, প্রথম গ্রন্থটি) ভাস্করাচার্যেরই রচনা—সূচনায় তিনি গণেশাদি দেবতার স্তুতি সহযোগে এই গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে নিজেই সেটি উল্লেখ করেছেন। এছাড়া এতে অনেক গাণিতিক প্রশ্ন সরাসরি লীলাবতীকেই করা হয়েছে—কখনও নাম ধরে, কখনও আবার 'চঞ্চলাক্ষি', 'বালকুরঙ্গলোলনয়নে' এইসব সম্বোধনে। যেমন একটিতে : "অয়ি লীলাবতি! বিদুষি বালিকে! তোমার যদি যোগ ও বিয়োগ প্রক্রিয়া জানা থাকে তাহলে বলো—২, ৫, ৩২, ১৯৩, ১৮, ১০ এবং ১০০ যোগ করলে কত হয় এবং এই যোগফল ১০,০০০ থেকে বিয়োগ করলে কত অবশিষ্ট থাকে।"

দ্বিতীয়ত, লীলাবতী বিবাহের অব্যবহিত পরেই পতিহীনা হন—এ নিয়েও বিতর্কের অবকাশ আছে। সম্ভবত তিনি চিরকুমারী ছিলেন। কথিত আছে, ভাস্করাচার্য লীলাবতীর ভাগ্যগণনা করে জানতে পারেন, একটি অজ্ঞাত সুনির্দিষ্ট মুহূর্তে তাঁকে পাত্রস্থ করা না হলে তাঁর ভাগ্যে অকালবৈধব্য আছে। সেই বিশেষ মুহূর্তটি নির্ভুলভাবে নিরূপণ করার জন্য তিনি একটি জলঘড়ি নির্মাণ করেন। একটি জলপূর্ণ বড়ো পাত্রে ছিদ্রযুক্ত একটি ছোটো পাত্র ভাসমান অবস্থায় রাখা হয়। ছোটো পাত্রটির আকার এবং ছিদ্রটির মাপ এমনভাবে নির্দিষ্ট করা হয় যাতে ওই অভীষ্ট মুহূর্তটি এলেই ওই ছোটো পাত্রটি জলমগ্ন হয়ে যায়। এদিকে শিশুসুলভ কৌতূহলবশত লীলাবতী যখন জলঘড়িটি নিবিষ্টমনে নিরীক্ষণ করছিলেন, তখন তাঁর পোশাক থেকে একটি মুক্তাদানা খসে গিয়ে পাত্রটিতে পড়ে যায় এবং ছিদ্রটি সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে গিয়ে যন্ত্রটি বিকল হয়ে পড়ে। ফলে অভীষ্ট মুহূর্তটি নিরূপণে বিঘ্ন ঘটে যাওয়ায় ভাস্করাচার্য কোনওরকম ঝুঁকি না নিয়ে লীলাবতীকে চিরকুমারী রাখার সিদ্ধান্ত নেন। তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়া এবং পাশাপাশি পড়াশোনায় আগ্রহী করে তোলার উদ্দেশ্যে তিনি 'লীলাবতী' রচনা করেন। তিনি বলেন : "তোমার নামে আমি একটি গ্রন্থ রচনা করব, যা শেষ সময় পর্যন্ত টিকে থাকবে, কারণ সুনাম হল দ্বিতীয় জীবন এবং মহান সৃষ্টির স্থায়িত্বকাল অনন্ত।"

এই কাহিনির সত্যাসত্য নিয়ে অবশ্য সন্দেহের অবকাশ রয়ে গেছে। যাই হোক, তেরোটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত এই গ্রন্থটিতে ভাস্করাচার্য বিভিন্ন সংজ্ঞা ও সূত্রের সাহায্যে পাটিগণিত এবং সামতলিক ও ঘন জ্যামিতির মূল বিষয়গুলি আলোচনা করেছেন। যেমন, পাটিগণিতে সংখ্যাগণনা, যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ-বর্গ-বর্গমূল-ঘন-ঘনমূল—এই আটটি মৌল প্রক্রিয়া, অনুপাত ও সমানুপাত, বিপরীতক্রিয়া (সরলীকরণ), সুদকষা, ভগ্নাংশ, লাভক্ষতি, সমান্তর ও গুণোত্তর প্রগতি। শুধু গুণনেরই ছটি পদ্ধতির উল্লেখ করেছেন তিনি। এগুলি হল : স্বরূপ, তৎস্থ, বিভাগ, খণ্ড, স্থান এবং ইষ্ট। এছাড়া তিনি 'সবক্' নামে আর একটি গুণন পদ্ধতিরও উল্লেখ করেছেন গ্রন্থটির একটি পাণ্ডুলিপির টিপ্পনীরূপে। গ্রন্থটিতে তিনি বিন্যাস (permutation) ও সমবায় (combination)-এর সূত্রও দিয়েছেন। আলোচনা করেছেন একালে প্রচলিত ত্রৈরাশিকার (ঐকিক নিয়ম—rule of three) সম্প্রসারণ পঞ্চরাশিকা থেকে একাদশরাশিকা পর্যন্ত!

সামতলিক ও ঘন জ্যামিতিতে তিনি আলোচনা করেছেন ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, আয়তক্ষেত্র, বর্গক্ষেত্র, ট্রাপিজিয়াম ইত্যাদির বিভিন্ন ধর্ম। অবতারণা করেছেন কিছু বাস্তব বিষয়েরও—যেমন গর্ত ও কূপ খনন, পাঁজা তৈরি, কাঠের মাপ, সূর্যঘড়ির কাঁটার এবং অন্যান্য বস্তুর ছায়ার পরিমাপ ইত্যাদি।

বেশ কয়েক শতাব্দী ধরে লীলাবতী প্রচলিত ছিল পাটিগণিতের পাঠ্যগ্রন্থরূপে। মূল সংস্কৃত থেকে এটি বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। অনেক প্রাচীন গ্রন্থাগারে এখনও রক্ষিত আছে হাতে লেখা

লীলাবতী। গ্রন্থটির ওপর শতাধিক ভাষ্য আজও পাওয়া যায়। গ্রন্থটির দুটি ইংরেজি এবং তিনটি ফারসি অনুবাদেরও সন্ধান পাওয়া গেছে। বিভিন্ন ভাষার আকরগ্রন্থ, কোষগ্রন্থ, অভিধানে লীলাবতী সম্বন্ধে আলোচনাই প্রমাণ করে এটি কত জনপ্রিয় ছিল।

লীলাবতী প্রসঙ্গে যে কথাটি উল্লেখ না করলে এই আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে তা হল : ভাস্করাচার্যের বিদুষী কন্যার প্রসঙ্গে না গিয়েও বলা যায় গ্রন্থটির সরস, কাব্যিক, লীলাময় রচনাশৈলীর জন্য এর 'লীলাবতী' নাম সত্যই সার্থক।

লীলাবতীর কিছু দৃষ্টান্ত : লীলাবতীর বৈশিষ্ট্য হল, অনেক ক্ষেত্রেই গ্রন্থকার গাণিতিক সমস্যা বা অঙ্কগুলি তুলে এনেছেন দৈনন্দিন জীবনের সাদামাটা ঘটনা থেকে, পরিবেশন করেছেন গল্পচ্ছলে। যেমন গ্রন্থটির তৃতীয় পরিচ্ছেদের ৫৪ তম অনুচ্ছেদে প্রদত্ত একটি অতিরিক্ত প্রশ্ন : প্রণয়ীর সঙ্গে হুল্লোড়ের সময় এক তরুণীর মুক্তাহারটি ছিঁড়ে গিয়ে মুক্তাদানাগুলি ইতস্তত ছড়িয়ে পড়ল। এগুলির এক ষষ্ঠাংশ মেঝেতে ও এক পঞ্চমাংশ পড়ল বিছানায়। তরুণীটির হাতে এল এক তৃতীয়াংশ, এক দশমাংশ পেয়ে গেল তার প্রণয়ী। হারের সুতোয় তখনও ছয়টি মুক্তাদানা লেগে থাকলে মোট কতগুলি মুক্তাদানা দিয়ে গাঁথা হয়েছিল হারটি?

সমস্যাটির উপস্থাপন যথেষ্ট আকর্ষণীয় হলেও এর সমাধান আদৌ কঠিন নয়। দেখা যাচ্ছে, মুক্তাদানাগুলির মোট ১/৬ + ১/৫ + ১/৩ + ১/১০ অংশ বা ২৪/৩০ = ৪/৫ অংশ রয়েছে হারের সুতোটির বাইরে। অতএব সুতোয় রয়েছে ১—৪/৫ = ১/৫ অংশ, যার অর্থ ১/৫ অংশ = ৬। তাহলে সহজেই পাওয়া যাচ্ছে, ৬ x ৫ = ৩০টি মুক্তাদানা দিয়ে তৈরি হয়েছিল হারটি।

সবক্ গুণন : গুণ করার এই পদ্ধতিটি বর্তমানে প্রচলিত সাধারণ নিয়মের মতোই। তবে এর অতিরিক্ত সুবিধা, এতে গুণ করার সময় 'হাতে রাখা'র প্রয়োজন হয় না। ধরা যাক, আমরা ৮৭২৯ x ৬৮৫এই গুণটি করতে চাই। এজন্য প্রথমে ৪ x ৩ আকারের একটি ছক কেটে নিয়ে ছকটিতে ৪ x ৩ = ১২টি ছোটো ছোটো ঘরে ভাগ করে নিতে হবে এবং প্রত্যেক ছোটো ঘরকে দুভাগে ভাগ করতে হবে, ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে। এবার গুণ্যের ৪টি অঙ্ক ছকের মাথায় এবং গুণকের ৩টি অঙ্ক ছকের ডানপাশে বসাতে হবে। এরপর গুণকের এক একটি অঙ্ক দিয়ে গুণ্যের এক একটি অঙ্ককে গুণ করতে হবে; গুণফলের দশকের অঙ্কটি বসবে সংশ্লিষ্ট ছোটো ঘরের ওপরের দিকে, এককের অঙ্কটি তলার দিকে। যেমন ৯ x ৬ = ৫৪; এর ৫ বসবে ওপরে আর ৪ নিচে। এইভাবে সবকটি গুণ হয়ে গেলে ছকটির কৌণিক ঘরগুলি যোগ করে নিয়ে পাওয়া যাবে গুণফলটি।

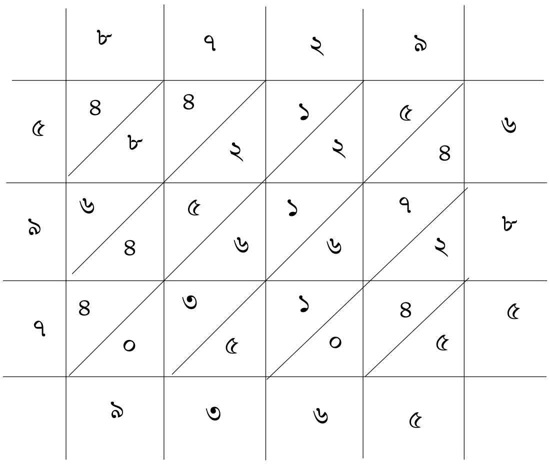

এখানে ডানদিক থেকে,

৫ = ৫

২ + ৪ + ০ = ৬

৪ + ৭ + ৬ + ১ + ৫ = (২) ৩

(২) + ৫ + ২ + ১ + ৬ + ৩ + ০ = (১) ৯

(১) + ১ + ২ + ৫ + ৪ + ৪ = (১) ৭

(১) + ৪ + ৮ + ৬ = (১) ৯

(১) + ৪ = ৫

অতএব গুণফল = ৫৯৭৯৩৬৫

বর্গনির্ণয় : কোনও সংখ্যার বর্গ নির্ণয় করার জন্য ভাস্করাচার্য প্রদত্ত তৃতীয় পদ্ধতিটির ভিত্তি বীজগণিতের এই সূত্রটি :

$(ক+খ)\ (ক-খ) + খ^{২} = ক^{২} - খ^{২} + খ^{২} = ক^{২}$

ক সংখ্যাটির বর্গ করতে হলে এমন একটা সংখ্যা বেছে নিতে হবে যাতে ক+খ সংখ্যাটি ১০-এর কোনও ঘাতের গুণিতক হয়। পদ্ধতির বাকি অংশটি একটি উদাহরণের সাহায্যে দেখে নেওয়া যাক।

ধরা যাক, আমরা ৯৮৮ সংখ্যাটির বর্গ চাই। আগের সূত্র অনুযায়ী $৯৮৮^২ = (৯৮৮+১২)\ (৯৮৮—১২) + ১২^২ = ১০০০ \times ৯৭৬ + ১৪৪ = ৯৭৬১৪৪$, অর্থাৎ প্রায় মুখে মুখেই আমরা বর্গফলটি পেয়ে গেলাম। তেমনি $৭৯৮৯^২ = (৭৯৮৯ + ১১)\ (৭৯৮৯—১১) + ১১^২ = ৮০০০ \times ৭৯৭৮ + ১২১ = ৬৩৮২৪০০০ + ১২১ = ৬৩৮২৪১২১$

সমষ্টি, বর্গসমষ্টি, ঘনসমষ্টি : লীলাবতীতে ভাস্করাচার্য আর এক ধরনের আপাতকঠিন সমস্যা হাজির করেছেন, যার সমাধান তাঁর নির্দেশিত পথে খুব সহজেই পাওয়া যায়। এরকম একটি হল : এমন ৪টি, ৫টি, ৬টি... সংখ্যা নির্ণয় করতে হবে যাদের সমষ্টি, তাদের বর্গসমষ্টির সমান। তেমনি এমন ৪টি, ৫টি, ৬টি... সংখ্যার সন্ধান চাই যাদের বর্গসমষ্টি তাদের ঘনসমষ্টির সমান হবে।

৪টি সংখ্যার ক্ষেত্রে আমরা দুটি সমস্যাই একসঙ্গে সমাধানের চেষ্টা করি ভাস্করাচার্যের নির্দেশিত পদ্ধতিতে। এখানে প্রথমে ১: ২: ৩: ৪ এই অনুপাতে থাকা যে কোনও চারটি সংখ্যা নিয়ে শুরু করতে হবে, যেমন ১, ২, ৩, ৪ অথবা ২, ৪, ৬, ৮ অথবা ১/১২, ১/৬, ১/৪, ১/৩। ধরা যাক, আমরা শুরু করলাম, ১, ২, ৩, ৪ নিয়ে।

এখন $১+২+৩+৪ = ১০$ ...(১)

$১^২+২^২+৩^২+৪^২ = ৩০$ ...(২)

$১^৩+ ২^৩ + ৩^৩+ ৪^৩ = ১০০$ ...(৩)

$(১) \div (২) = ১০/৩০ = ১/৩$

$(২) \div (৩) = ৩০/১০০ = ৩/১০$

সুতরাং লীলাবতীতে বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী আমাদের প্রথম প্রশ্নের উত্তর ১x১/৩, ২x ১/৩, ৩x১/৩ এবং ৪x১/৩ বা ১/৩, ২/৩, ১ এবং ৪/৩। এগুলিই উদ্দিষ্ট সংখ্যা। কারণ,

$১/৩ + ২/৩ + ১ + ৪/৩ = ১০/৩$
$= (১/৩)^২ + (২/৩)^২ + ১^২ + (৪/৩)^২$

তেমনি দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর ১x৩/১০, ২x৩/১০, ৩x৩/১০, ৪x৩/১০ বা ৩/১০, ৬/১০ = ৩/৫, ৯/১০, ১২/১০ = ৬/৫। এগুলিই উদ্দিষ্ট সংখ্যা কারণ $(৩/১০)^২ + (৩/৫)^২ + (৯/১০)^২ + (৬/৫)^২ = ২৭/১০ = (৩/১০)^৩ + (৩/৫)^৩ + (৯/১০)^৩ + (৬/৫)^৩$।

মজার কথা, আমরা যদি ১, ২, ৩, ৪-এর বদলে ১:২:৩:৪ অনুপাতে থাকা অন্য যেকোনও চারটি সংখ্যা দিয়ে শুরু করতাম—যেমন, ২, ৪, ৬, ৮ বা ৩, ৬, ৯, ১২—তাহলেও আমরা এই সমাধানেই পৌঁছাতাম।

পদ্ধতিটি ৪-এর বদলে ৫,৬,৭...টি সংখ্যার ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা যায়। তবে ৫টি সংখ্যার ক্ষেত্রে ১:২:৩:৪:৫—এই অনুপাতে থাকা ৫টি সংখ্যা নিয়ে শুরু করে আগের পদ্ধতিতে এগোতে হবে। পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে, এক্ষেত্রে প্রথম প্রশ্নে উদ্দিষ্ট ৫টি সংখ্যা হবে ৩/১১, ৬/১১, ৯/১১, ১২/১১ আর ১৫/১১। এদের সমষ্টি ও বর্গসমষ্টি উভয়েই হবে ৪৫/১১। তেমনি দ্বিতীয় প্রশ্নের উদ্দিষ্ট ৫টি সংখ্যা হবে ১১/৪৫, ২২/৪৫, ৩৩/৪৫, ৪৪/৪৫ আর ৫৫/৪৫, যাদের বর্গসমষ্টি = ঘনসমষ্টি = ১৩৩১/৪০৫।

মূল গ্রন্থখানি বিভিন্ন গাণিতিক পদ্ধতির আলোচনায় কতখানি সমৃদ্ধ ছিল, তার খানিকটা আভাস পাওয়া যায় এইসব নমুনা থেকে। ✠

সহায়ক গ্রন্থ

১। শৈলেশ দাশগুপ্ত, *হিন্দুগণিত ও ভাস্করাচার্য* (বেস্ট বুকস : কলকাতা, ২০০২)

২। প্রদীপকুমার মজুমদার, *প্রাচীন ভারতে গণিতচর্চা* (গ্রন্থমেলা, কলকাতা, ১৩৮৬)

৩। Ed. K.V. Sharma, *Lilavati & Bhaskaracharya II* (V.V. Research Institute : Hoshiarpur, 1975)

৪। Ed. P.R. Ray & S. N. Sen, *The Cultural Heritage of India* (The RKM Institute of Culture : Kolkata, 2001), Vol VI

৫। Bibhuti Bhusan Datta & Avadesh Narayan Singh, *History of Hindu Mathematics* (Asia Publishing House : Bombay, 1962)